ফিরিওয়ালা

(গল্পগ্রন্থ – বেণীগীর ফুল বাড়ি)

অনেকদিন আগে বাল্যজীবনে যখন কলকাতায় এসে কলেজে পড়াশুনা আরম্ভ করি, তখন হ্যারিসন রোডের একটা ছাত্রদের মেসে থাকতাম।

একজন ফিরিওয়ালা সে-সময় প্রত্যহ আমাদের মেসে আসত, তার মাথায় একটা চ্যাপ্‌টা গড়নের হাঁড়ি—তাতে থাকত ক্ষীরমোহন ও রসগোল্লা। লোকটা সত্যিই ভারি চমৎকার ক্ষীরমোহন তৈরি করতে পারত—এবং তার চেয়েও বড় গুণ ছিল লোকটার,—সে ধারে খাবার দিয়ে যেত মেসের ছেলেদের।

মেসে জিনিসপত্র যারা বিক্রি করে, ধার না দিলে তাদের ব্যবসাই চলে না—একথা তাদের চেয়ে ভালভাবে কেউ বুঝত না। ধারও যেমন তেমন ধার নয়, মেসের ছেলেরা নির্বিবাদে দিনের পর দিন খেয়ে চলেছে, মাস শেষ হলে দেখা গেল, ফিরিওয়ালার ক্ষীরমোহনের দেনা দাঁড়িয়েছে এক-একজনের কাছে দশ টাকা, পনেরো টাকা। মজা হচ্ছে এই যে, টাকা শোধ না হলেও এসব ক্ষেত্রে ধার দিয়েই যেতে হবে—কারণ খাবার খাইয়ে না যেতে পারলে টাকা কখনই আদায় হবে না।

ক্ষীরমোহনওয়ালার মুখে বিনয়ের হাসি সর্বদাই লেগে থাকত, আমি কখনও তার হাসিমুখ ছাড়া দেখিনি অন্তত। ও এলেই বড় ভাল লাগত—ওর মুখের মজার মজার হাসির গল্প শুনতে। মেসের ছেলেরা গল্প শুনতে শুনতে চার পাঁচ টাকার খাবার খেয়ে ফেলত সবাই মিলে।

লোকটার চেহারা ছিল ভাল। বেশ দোহারা গঠনের, রং একটু ফর্সা, বড় বড় গোঁপজোড়া দেখলেই আমাদের খুব হাসি পেত, তার ওপরে ওর মুখে ওর দেশের নানান রকম মজার গল্প শুনতে গিয়ে হাসতে হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরবার উপক্রম হত।

ঘড়ির কাঁটার মত লোকটা আসত আমাদের মেসে।

ঠিক সাতটা যে-ই বাজল, মুখ ধুয়ে উঠে সবাই বসেছে, এইবার চা আর খাবার আনবার দরকার, অমনি দেখা গেল ক্ষীরমোহনওয়ালা তার চ্যাপ্‌টা হাঁড়ি মাথায় করে হাজির হয়েছে। দুঘণ্টা ধরে নানারকম হাসির গল্পের মধ্যে বেচা-কেনা নিষ্পন্ন করে সে তার চ্যাপ্‌টা হাঁড়িটা মাথায় তুলে আবার ফিরে যেত। এই রকম দুই তিন বছর কেটে গেল।

তারপর আমাদের মেস গেল ভেঙে, আমিও অন্যত্র গিয়ে উঠলাম। দিনকতক পরে আমার নতুন মেসে আবার সেই ফিরিওয়ালা গিয়ে হাজির।

মেসের ছেলেদের মন কি করে পেতে হয়, এ আর্ট ভালভাবে জানা ছিল লোকটার। মাসখানেক যেতে না যেতে ও এখানেও সবার অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। এক হাঁড়ি করে প্রতিদিন বিক্রি হতে লাগল এ মেসেও।একদিন ক্ষীরমোহনওয়ালা (ওর নামটা বোধ হয় ছিল পঞ্চানন, কিন্তু ওর নাম ধরে কেউ কোনোদিন ডাকেনি, কাজেই ঠিক মনে নেই) এসে আমাদের হাতজোড় করে বল্লে—বাবুমশাইরা, আমার ছেলের বিয়ের আজ বৌভাত, আপনাদের দোরে খেয়েই তো আমি মানুষ। আপনারা সবাই আমার মনিব। বলতে সাহস পাইনে, তবে যদি আপনারা দয়া করে আমার ওখানে আজ পায়ের ধুলো দিয়ে মিষ্টিমুখ করে আসেন, তবে বড় খুশি হই।

মেসের অনেকে গেল, কি কারণে আমার যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত যাওয়া ঘটে নি। যারা গিয়েছিল তারা ফিরে এসে ফিরিওয়ালার খাতির ও যত্ন আতিথ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করলে।

বেলেঘাটা অঞ্চলে কোথায় একটা ছোট্ট খোলার বাড়িতে ফিরিওয়ালার বাসা। তারই সামনে অন্য একখানা খোলার বাড়ির বাইরের ঘরে ওদের বসবার জন্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানা পাতা হয়েছিল। পান তো ছিলই, এমন কি কাঁচি সিগারেটের পর্যন্ত ব্যবস্থা ছিল। মেসের ছেলেরা নববধূর জন্যে কিছু না কিছু উপহার নিয়ে গিয়েছিল। বৌটিও বেশই হয়েছে সবাই বল্লে, তবে বয়েস কম, এগারো বছরের বেশি নয়—ছেলের বয়েসই সবে ষোল বছর।

তারপর ফিরিওয়ালা সকলকে পরিতোষ করে খাইয়ে ছেড়েছে—লুচি, তরকারি, মাছ, দই, সন্দেশ ইত্যাদি। খাওয়ার পর আবার পান সিগারেট। একজন সামান্য ফিরিওয়ালা যে এমন চমৎকার খাতির যত্ন করবে ভদ্রলোকের ছেলেদের, সেটা এমন বেশি কথা কিছু নয়, কিন্তু তার আয়োজন যে এমন ত্রুটিশূন্য হবে, তার ঘর দোর, বসবার বিছানা যে এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে এটাই অনেকে আশা করেনি। এমন কি, যাবার সময়ে সকলে ঠিক করেই গিয়েছিল, যাচ্ছি বটে—নিতান্ত গরিব লোকটা নিমন্ত্রণ করে ফেলেছে, না গেলে মনঃক্ষুণ্ণ হবে তাই যাওয়া। ওর ছেলের বউয়ের মুখদেখানি স্বরূপ কিছু কিছু ওর হাতে দিয়েই চলে আসবে, কিছু খাবে না কেউ সেখানে। তার পরিবর্তে তারা যা দেখলে, তা আশাতীত বটে তাদের পক্ষে। দুতিন-দিন ধরে মেসে ফিরিওয়ালার ছেলের বিয়ের কথাই চলল।

তারপর আবার ফিরিওয়ালা মেসে আসতে লাগল। আগের চেয়ে তার দশগুণ খাতির বেড়ে গেল আমাদের মেসে। ক্ষীরমোহন এক হাঁড়ি করে উঠত আগে—এখন দুবেলা ওঠে দু-হাঁড়ি।

ধড়িবাজ ব্যবসাদারও বটে লোকটা।

আরও বছর দুই পরে আমার ছাত্রজীবন শেষ হলো, আমি কলকাতার বাইরে গেলাম চাকুরি নিয়ে এবং সেখানে সাত আট বছর কাটিয়ে দিলাম। কলকাতার জীবন ক্রমশ দূরের হয়ে গেল—মেসের কথা, পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের কথা আর তেমন করে ভাবিনে। সেবার পূজার পূর্বে বিশেষ কি কাজে কলকাতায় এসে দেখলাম, আমার পূর্ব-পরিচিত সেই ক্ষীরমোহনওয়ালা হাঁড়ি মাথায় নিয়ে মেসে খাবার বিক্রি করতে এসেছে।

আমি বল্লাম—কিগো, চিনতে পার?

ফিরিওয়ালা আমায় দেখে চিনতে পারলে, খুব খুশি হলো। প্রণাম করে বললে—বাবুমশাই, চিনতে পারব না আপনাদের? আপনাদের দোরে খেয়ে মানুষ আর আপনাদেরই চিনব না? তা এখন কোথায় আছেন? অনেক কাল আপনাকে দেখিনি। বিয়ে-থা করেছেন বাবু? ছেলেপিলে হয়েছেন?

আমি আমার সব খবর মোটামুটি তাকে দিয়ে জিগ্যেস করলাম—তোমার সব খবর ভাল?আছ কেমন?তোমার ছেলেটি এখন কি করে?

লোকটা চুপ করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—বাবু, সে নেই।

আশ্চর্য হয়ে বললাম—তোমার ছেলেটি নেই! মারা গিয়েছে? কতদিন হলো?

ফিরিওয়ালার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল। ময়লা কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছে বললে—বাবু, তার কি হয়েছে তা যদি জানতাম, তা হলে তো মনটা শান্ত হত। আর বছর মাঘ মাসে একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল বৌবাজার যাব বলে। বৌবাজারে আমাদের দেশের একজন লোকের মুদিখানার দোকান আছে। সেই যে বাবু গেল, আর এল না।

—খুঁজেছিলে?

—খোঁজার কি কিছু বাকি রেখেছিলাম বাবু? সব হাসপাতাল সব জায়গা খোঁজ করেছিলাম—কোন সন্ধান নেই। এখন সব আশা ছেড়ে দিয়েছি বাবু। আপনার সঙ্গে একটা কথা বলব—কাল থাকবেন?

পরদিন সকালে ফিরিওয়ালা আবার এসে আমার ঘরের দোরের সামনে দাঁড়াল। বললাম—এস, ঘরের মধ্যে এস, কেউ নেই—কি কথা বলবে বলছিলে?

—বাবু, আপনি একটু খবরের কাগজে লিখে দেবেন ছেলের কথাটা? আমায় লোকে বলে তুমি কাগজে লিখে দাও, তা হলে ছেলে পাওয়া যায়। দেবেন লিখে বাবু?

কোথায় কি লিখে দেব বুঝতে পারলুম না। এতদিন পরে লিখে দিলেও যে বিশেষ কোনো ফল হবে, সে সম্বন্ধে আমার নিজের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তবুও পুত্রশোকার্ত পিতাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বল্লুম, আচ্ছা, তুমি বলে যাও, আমি লিখে নিই। কি রকম দেখতে ছিল তোমার ছেলে? বয়েস কত?

কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে আমি নিজের খরচে দু'তিনখানা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে গেলাম। বাবা ননী, ফিরে এস, তোমার মা মৃত্যুশয্যায়, যদি শেষ দেখা করতে চাও—ইত্যাদি।

এর ফলাফলের কথা আমি কিছু জানিনে—কারণ তিনচার দিনের মধ্যেই আমি আবার কলকাতা থেকে চলে গেলাম।

পুনরায় কলকাতায় ফিরলুম দু-বছর পরে।

কলকাতায় এবার এসেছিলাম খুব অল্পদিনের জন্যে, আগের সেই মেসটাতেই উঠেছিলাম—কিন্তু ফিরিওয়ালাকে এবার আর দেখলাম না সেখানে, তার কথা যে খুব মনে ছিল, তাও নয়।

নিজের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরতাম, অন্য কারও কথা ভাববার অবকাশ ছিল কোথায়?

হয়তো বা ওকে দেখলে সব কথা মনে পড়ত, কিন্তু তা হয় নি।

তারপর আবার চলে গেলুম কলকাতা থেকে।

বিদেশে থাকবার সময়ে অবসর-সময়ে আমার মাঝে মাঝে দু-একবার ফিরিওয়ালা ও তার ছেলের কথা মনে হত—তারপরে একেবারে ভুলে গেলাম।

ন-বছর পরে বিদেশে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে এসে কলকাতাতেই চাকুরির খোঁজে এলাম, মাস কয়েক পরে একটা চাকুরি পেয়েও গেলাম।

মেসেই থাকি। পূর্বে যে অঞ্চলে থাকতাম, সেই অঞ্চলে বটে, তবে অন্য বাড়িতে। হঠাৎ একদিন দেখি সেই ফিরিওয়ালা। সেই চ্যাপ্‌টা ধরনের হাঁড়িতে ক্ষীরমোহন ভরা, আগেকার মতই। ওকে দেখে কি জানি কেন, আমি হঠাৎ বড় খুশি হয়ে উঠলুম। এই যে মেসে এসে উঠেছি এখানে সবাই অপরিচিত, এদের সঙ্গে আমার মনের কোনো যোগই নেই কোনো দিক দিয়ে। এই অজ্ঞাত ব্যক্তিদের ভিড়ের মধ্যে এই লোকটিই একমাত্র আমার বহুদিনের পরিচিত—আমার বহুকাল পূর্বের ছাত্রজীবনের সঙ্গে কেবল এই লোকটিরই যোগ আছে—আর কারও নেই এখানকার মধ্যে।

আমাকে কিন্তু ও প্রথমটাতে আদৌ চিনতে পারেনি। আমার চেহারার অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল এর মধ্যে, বয়েসও হয়েছিল, হবারই কথা—আমার বর্তমান জীবন ও ছাত্রজীবনের মধ্যে কুড়ি-একুশ বৎসরের ব্যবধান।

এখনও লোকটা ঠিক সেই আগের দিনের মতই সেই একই ধরনের চ্যাপ্‌টা হাঁড়ি মাথায় করে মেসে মেসে ক্ষীরমোহন ফিরি করে বেড়ায়।

ওকে ডাকলুম। ক্ষীরমোহন কিনে পয়সা দেবার সময় ও আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে দু-একবার, কিন্তু কিছু বলতে সাহস করলে না।

আমি বল্লুম—কি, চিনতে পারো?

ফিরিওয়ালা হাতজোড় করে প্রণাম করে বল্লে—তাই চেয়ে চেয়ে দেখছি, বাবুমশাই না? ...তা এখন আর চোখে তেমন তেজ নেই আগেকার মত। এতদিন কোথায় ছিলেন বাবু?

ফিরিওয়ালার চেহারার কিন্তু বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম—মাথার চুল পাকেনি, দাঁত পড়েনি, মুখের চেহারা ঠিক তেমনি আছে।

বল্লাম—আমি দেখছি—তোমার চেহারা রাখলে কি করে? কিছুই বদলায়নি, মনে হচ্ছে যখন হ্যারিসন রোডের মেসে যেতে, সে যেন কালকের কথা।

ফিরিওয়ালা বল্লে—আর বাবুমশাই, চেহারা!

হঠাৎ মনে পড়ল ওর নিরুদ্দিষ্ট ছেলের কথা। আগে মনে হওয়াই উচিত ছিল সেটা, কিন্তু তা হয় নি। একটু ইতস্তত করে জিগ্যেস করলুম—হ্যাঁ ভাল কথা, তোমার সেই ছেলেটি—

ফিরিওয়ালা বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে বল্লে—না বাবু, সে সেই যে চলে গেছে, সেই শেষ।

খুব দুঃখিত হলাম শুনে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও তাহলে কোনো কাজহয়নি!

—ছেলের বৌটি কোথায়?

—আমার কাছেই আছে বাবুমশায়, আর কোথায় যাবে?

—এখন আছ কোথায়?

—বেলেঘাটায় সেই বাসাতেই।

—তোমার স্ত্রী আছে তো?

—না বাবু—সেও আজ চার বছর হলো মারা গিয়েছে। ছেলের নিরুদ্দেশের পর তার শরীর সেই যে ভেঙে গেল, আর তা ভাল হয়নি। বাবু এসে পড়েছেন, ভাল হয়েছে—

—কেন বল তো?

—আমাকে কিছু সাহায্য করুন বাবুমশাই। বারো বছর হয়ে গেল, এবার খোকার কুশপুতুল দাহ করে শ্রাদ্ধ করব। বিধেন নিয়েছি ভটচায্যি মশায়ের কাছ থেকে। আমার তেমন রোজগারপাতি নেই আজকাল—ভিক্ষেসিক্ষে করে ছেলের কাজটা করব—

ওকে একটি টাকার বেশি দিতে পারলাম না—নিজেরই চাকুরির অবস্থা সুবিধের নয়, মেসের খরচ চালানোই দুর্ঘট হয়ে পড়েছে।

দিন পনেরো পরে ফিরিওয়ালা এসে আমায় বল্লে—বাবু, আজ আমার ছেলের কাজ, আপনি একটু পায়ের ধুলো যদি দেন গরিবের বাড়িতে, ছোট মুখে বলতে সাহস হয় না আপনাকে—আপনার দয়া—

ওর অনুরোধ এড়াতে পারলুম না—মন সরলো না। বহুদিনের যোগাযোগ ওর সঙ্গে। আমার ছাত্রজীবনের আমলের আর কোনো পরিচিত লোক কলকাতায় নেই—এই ফিরিওয়ালা ছাড়া। যেতেই হলো।

ও একটা ঠিকানা আমায় দিয়ে গেল বেলেঘাটার—যে অঞ্চলে জীবনে কখনও যাইনি, যাবার প্রয়োজনও হয়নি এতদিন। একটা বস্তির খানকুড়ি বাইশ ঘরের মধ্যে অতি কষ্টে ওর ঘর খুঁজে বার করলুম। সামনে একটা ডোবা। সামনে একটা নীচু খোলার ঘরে ফিরিওয়ালা আমায় নিয়ে গিয়ে যত্ন করে বসালে। কেওড়া কাঠের তক্তপোশের ওপর পুরু করে বিছানা পাতা। আমি আসাতে ফিরিওয়ালা যে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছে—ওর প্রত্যেক কথার মধ্যে, হাত পা নাড়ার ভঙ্গির মধ্যে তার প্রকাশ।

আমি জিগ্যেস করলাম—এ বাড়িতে কতদিন আছ?

—আজ ত্রিশ বছর বাবু, এ বাড়িতে আমার খোকা জন্মায়—

তারপর সে ব্যস্ত হয়ে কোথায় চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই একবাক্স সিগারেট এনে আমার সামনে রেখে দিয়ে বল্লে—নিন, বেশ আরাম করুন বাবু, গরিবের কুঁড়েয় যখন এসেছেন—

ওর হাব-ভাব দেখে মনে হবার কথা নয় যে আজ ওর পুত্রের শ্রাদ্ধ। যেন কোনো উৎসব আনন্দের কাজ চলছে বাড়িতে। আমার মনে কেমন সংকোচের ভাব এল, আমি এসেছি বলে আমায় খাতির করতে গিয়ে ওকে উৎসবের মতই আয়োজন করতে হয়েছে।

আমায় বল্লে—আমার খোকার যখন বিয়ে হয়, আজ অনেকদিন আগেকারকথা—তখন আপনাদের সেই পুরোনো মেসের রমেশবাবু, হরিধনবাবু, গোপালবাবু, সতীশবাবু ওঁরা সব এসে, এই ঘরে এই তক্তপোশেই বসেছিলেন। বড় ভাল লোক ছিলেন ওঁরা। রমেশবাবু ওইখানটাতে বসে চা আর খাবার খেলেন, আমার আজও মনে আছে। সতীশবাবু বল্লেন—ওহে, গরম গরম লুচি নিয়ে এস তো? আমি তখন খোলা চড়িয়ে আমার স্ত্রীকে দিয়ে আলাদা করে গরম লুচি ভাজাই—খেয়ে তাঁদের কি ফুর্তি বাবুমশাই! বল্লেন—বেশ করেছ, বেশ করেছ—আহা কি সব লোকই ছিল তখন। পান এনে দি বাবু, বসুন—

আমি সত্যিই অস্বস্তিবোধ করছিলুম। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল ওর ছেলের বিয়েতে সেদিন—বহুবছর আগের কথা—বিশ-বাইশ বছর হবে, সে কথা আমার মনে ছিল না, আজ ওর কথায় মনে হলো।

তখন কেন আসা হয়নি জানিনে—এতকাল পরে সেই ছেলের শ্রাদ্ধতে এসেছি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

লোকটা কিন্তু আমায় নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আমি ওর বাড়িতে এসেছি, এ যেন ওর কাছে মহাশুভ ঘটনা। বারবার সে আমার কাছে এসে আমার সুবিধা অসুবিধা দেখতে লাগল। বিশ বৎসর আগে যখন আমার মেসের বন্ধুরা ওর বাড়িতে এসেছিল ওর ছেলের বিবাহে, সেও ওর জীবনে দেখলুম এক অতি স্মরণীয় দিন হয়ে আছে—ঘুরে-ফিরে বারবার ও সেই কথাই পাড়তে লাগল।

—রমেশবাবুরা এলেন, তা আমি ওঁদের জন্যে সব আলাদা বন্দোবস্ত করেছিলাম। ফিরিওয়ালার কাজ করি বটে বাবু, কিন্তু আমি মানুষ চিনি বাবুমশাই। হরিধনবাবু বল্লেন—তুমি ক্ষীরমোহন বিক্রি কর, তোমার ছেলের বিয়েতে আমরা পেট ভরে ক্ষীরমোহন খাব। নিয়ে এস ক্ষীরমোহন। আমি বড় হাঁড়ির একহাঁড়ি ক্ষীরমোহন ওঁদের জন্যে আলাদা করে রেখেছিলাম। সতীশবাবু, রমেশবাবু খেয়ে খুব খুশি—তার পরের হপ্তায় সতীশবাবু আমায় পাঁচ সের ক্ষীরমোহনের অর্ডার দেন, বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য—

আমি বল্লাম—বিশ বছর আগেকার কথা, তোমার এত খুঁটিনাটি মনে আছে?

ফিরিওয়ালা বল্লে—তা থাকবে না বাবু? আপনারা তো আমার বাড়িতে রোজ রোজ পায়ের ধুলো দিচ্ছেন না। জন্মের মধ্যে কর্ম একটা দিন। তা মনে থাকবে না!

আর কিছুক্ষণ পরে আমি আরও গোটাদুই পান খেয়ে উঠবার চেষ্টা করছি, ফিরিওয়ালা জিভ কেটে বল্লে—তা কি হয় বাবু? এসেছেন যখন তখন—

আমি বল্লাম—না, শোন! আমি কিছু খেতে পারব না আজ—এ যদি আনন্দের কাজ হত, আমি—

—ও কথাই মুখে আনবেন না বাবু। আপনারা আমার মা বাপ—আমার খোকার সদ্‌গতি হবে না আপনি আজ এখানে সেবা না করলে—ব্রাহ্মণ দেবতা আপনি—

অগত্যা কিছু খেতেই হলো।

পাশের ঘরে আমার জন্যে পরিপাটি করে খাবার আসন পাতা। একটি ত্রিশ-বত্রিশবছরের বিধবা যুবতী আধ-ঘোমটা দিয়ে আমায় খাবারের থালা দিতে এল।

ফিরিওয়ালা বল্লে, এই আমার বৌমা। গড় কর বৌমা, ওঁদের খেয়েই আমরা মানুষ—ব্রাহ্মণ দেবতা—

বৌটি গলায় আঁচল দিয়ে অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

ফিরিওয়ালা কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে বল্লে—বৌমা বড় ভাল মেয়ে মশাই। খোকা যখন আমায় ছেড়ে পালাল, তখন বৌমার কাঁচা বয়েস, এই আঠারো কি উনিশ। সেই থেকে এই সংসারেই আছে, গরিবের সংসার, কখনও ভাল মন্দ খাওয়াতে পরাতে, পারিনি। মুখ বুজে সব সহ্য করে এসেছে। আমার পরিবার ওর ওপর একটু অত্যাচার করত, মিথ্যে কথা বলব না, দেবতা আপনারা। বলত তুই অলুক্ষুণে বৌ ঘরে এলি, আর ছেলে আমার

দেশছাড়া হলো। একদিনের জন্যেও বৌমা ব্যাজার হয়নি সে সব শুনে। এখন তো আর কেউ নেই—ও আছে আর আমি আছি। ওই আমার মা, ওই আমার মেয়ে—

ফিরিওয়ালার পুত্রবধূ ইতিমধ্যে দই আনতে গিয়েছিল বাড়ির মধ্যে।

আমি বল্লাম—তোমার বৌমা বরাবর তোমার কাছেই আছে?...বাপের বাড়ি কোথায়? সেখানে মাঝে মাঝে যাতায়াত আছে তো?...

—কোথায় বাবুমশাই? ওর তিন কুলে কেউ নেই। তাই তো মাঝে মাঝে ভাবি, বয়েস হয়েছে, আজ যদি চোখ বুজি, আমি তো বেশ যাব, পুত্তুরশোক জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু বৌমার কথা যখন ভাবি, তখন আর কিছু ভাল লাগে না। কার কাছে রেখে যাব ওকে, সোমত্ত বয়েস, এক পয়সা দিয়ে যেতে পারব না। কখনও ঘরের চৌকাঠের বাইরে পা দেয় নি—কি খাবে, কোথায় যাবে!

—ও কি বাবুমশাই, তা হবে না, ও ক'খানা ফেলে উঠতে পারবেন না, খেতেই হবে।

আহারাদি শেষ করে চলে আসবার সময় বিধবা মেয়েটি পান এনে রাখলে সামনে। তারপর আবার তার শ্বশুর ও সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

এরও বছরখানেক পরে পর্যন্ত ফিরিওয়ালা নিয়মিতভাবে আমাদের মেসে খাবার ফিরি করতে আসত। তারপর গত বৎসর পুজোর ছুটির আগে থেকে ও আর এল না। এখনও পর্যন্ত একদিনও আর তাকে দেখা যায় নি। মাঝে মাঝে লোকটার কথা মনে হয়—বেঁচে আছে না মরে গেল! খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত ছিল অবিশ্যি—কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি।